পথের টানে

নীলগিরির কোলে উদগামণ্ডলম্

অজয়কুমার ভট্টাচার্য

নীলগিরি পুনর্দর্শনের এক সুযোগ এসে গেল। নীলগিরি বলতে প্রথমেই যা মনে আসে তা হল চা, তারপর তার শৈলাবাস উটি যার স্থানীয় নাম উদগামণ্ডলম্। আবার উটি মনে হলেই মনে আসে একটি দৃশ্য। বিশাল কাচের জানালার পাশে আরামকেদারাতে অর্ধশায়িত মহাপুরুষ মহারাজ, সামনের উপত্যকা পার হয়ে দিগন্তবিস্তৃত নীল পর্বতশ্রেণির দিকে অনন্তপ্রসারী দৃষ্টি নিয়ে আত্মমগ্ন।

তাই সুযোগ আসতেই তা গ্রহণ করলাম। তবে সব শুরুর একটি শুরু আছে, তাই প্রথমে এলাম ব্যাঙ্গালোর। এখানে একটি গোটা পাহাড়ের দুটি শৃঙ্গ নিয়ে বায়ুসেনার ছাউনি, পুত্রের কর্মস্থল। একটি শৃঙ্গে একটি বিশাল যন্ত্র অনবরত ঘুরে আকাশে বিমানের গতিবিধি লক্ষ করছে, আর অপর শৃঙ্গটিতে একটি পাথরের তৈরি চিমনি, যার নামে জায়গাটার নাম চিমনি হিলস্। পাহাড়ের এক শৃঙ্গে ওই চিমনি অযত্নে পড়েছিল, এবারে দেখলাম তা সুন্দর ফুলগাছ লাগিয়ে, চারপাশ বাঁধিয়ে চমৎকার এক সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের দৃশ্য দর্শনের স্থান হয়েছে। এটি চিমনির মতন দেখতে হলেও বস্তুত তা একটি জলের ট্যাঙ্ক। গোটা পাহাড়টি বেষ্টন করে আছে উঁচু প্রাচীর ও তার ওপরে সাজানো বৃত্তাকার তীক্ষ্ণ কাঁটাতারের মণ্ডলী, আর তার ধারে ধারে রাস্তা। চারিদিক এক পাক ঘুরলে প্রায় সাড়ে তিন কিলোমিটার হাঁটা হবে। পরিচ্ছন্ন ঝকঝকে রাস্তা, ফুলের বাগান, রাস্তার পাশে সাজানো সুন্দর কোয়াটার্স। আর ওপর থেকে চারিদিকে মনোরম পাহাড়ের দৃশ্য মনকে প্রফুল্ল করে তোলে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ব্যাঙ্গালোর কিছু ব্রিটিশ সিভিলিয়ান ও সেনা ছাউনির আবাস হিসাবে গড়ে উঠেছিল। এই কর্কটক্রান্তির নিচে গরম দেশে সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে তিনহাজার ফুট উঁচু মালভূমি ব্রিটিশের নজর এড়ায়নি তার চিরবসন্তকালিক আবহাওয়ার জন্য। শহরে জলের অভাব তাই কয়েকটি ছোট ছোট জলাধার হল, তাদের মিলারস ট্যাঙ্ক বলা হত কিন্তু তা অপ্রতুল। কারিগরিতে বিশ্বাসী ব্রিটিশ এক বিশাল জলাধার নির্মাণ করল বৃষ্টির জল ধরতে। প্রায় সাড়ে ছয় বর্গ কিলোমিটার সে-জলাধারের জল অব্যবহার্য হয়ে গেল মাটির কোনও যৌগ মিশে। তারপর আর একটি জলাধার তৈরি হল আর এই পাহাড়ের মাথায় এক পাথরের স্তম্ভের ওপর জলের ট্যাঙ্ক বসল—শহরের সেনা ছাউনি ও বিশিষ্ট জনেদের নলবাহিত পানীয় জল সরবরাহ করতে। ১৮৯৫ সালে এই চিমনি সদৃশ

জলের ট্যাঙ্কের নামে স্থানের নাম হল চিমনি হিলস্।

এসে অবধি উটি মঠের সঙ্গে যোগাযোগ করছিলাম। কারণ মহারাজ জানিয়েছিলেন রান্নার পাচকটি পালিয়েছে, অতি কষ্টে দিন গুজরান হচ্ছে, তার মধ্যে অতিথিকে এই দুর্ভোগ ভোগানো ঠিক হবে না। হাল ছাড়িনি, কয়েকদিন বাদে আবার খবর নিলাম, পাচক তখনও পাওয়া যায়নি। বললাম, আমি বোঝা না হয়ে সাহায্য করব। গতবার কয়েকটি পদ রেঁধে খাইয়েছিলাম। মহারাজ বললেন—চলে আসুন। যাত্রার দিন স্থির হল। কর্ণাটকের রাষ্ট্রীয় পরিবহন ব্যবস্থা অতুলনীয়। ঘরে বসেই নেটে টিকিট কাটা সম্ভব পছন্দমতন সিট ছবিতে দেখে নিয়ে। মোবাইল ফোনে যাত্রাপথের শুভেচ্ছা ও PNR নম্বর এসে গেল।

ব্যাঙ্গালোরে তিনটি আশ্রম, দুটি মঠ ও একটি মিশন কেন্দ্র। তার মধ্যে বুল টেম্পল রোডের মঠটি সর্বাপেক্ষা পুরনো ও বিশিষ্ট। এখানে ঠাকুরের মন্দির ছাড়া অন্যতম আকর্ষণ সেই পর্বতসম প্রস্তরখণ্ড, যার ওপরে শ্রীশ্রীমা একদিন সূর্যাস্তের সময় ধ্যানস্থ হয়েছিলেন। রামকৃষ্ণানন্দজী এ-খবর পেয়ে সবিস্ময়ে বলেছিলেন, ''অ্যাঁ! মা পর্বতবাসিনী হয়েছেন!'' বলে প্রায় দৌড়তে দৌড়তে গিয়ে মায়ের চরণবন্দনা করেছিলেন 'সর্বমঙ্গলমঙ্গল্যে...' ইত্যাদি স্তব করে। স্থানটিতে একটি কাচের আধারে শ্রীমায়ের ছবি বসানো। আশপাশ ভক্ত ও সাধুদের ধ্যানজপের জন্য ব্যবহৃত হয়। জায়গাটি শান্ত, ধ্যানোদ্দীপক।

এছাড়া একটি নতুন সংযোজন হয়েছে এ-আশ্রমে, সেটিও অতি আকর্ষণীয়। স্বামীজী আমেরিকা যাওয়ার আগে ১৮৯২ সালে বেলগাঁও থেকে ব্যাঙ্গালোর এসে কালাপ্পাতে কোনও ভক্তের আবাসে উঠেছিলেন। ওই অঞ্চলের এক স্বর্ণকার, নাম 'সুগাপ্পা', প্রায়ই দেখতেন তাঁর বাড়ির সদর সংলগ্ন পাথর বসানো রোয়াকে এক তেজঃপূর্ণ সন্ন্যাসীকে বসে বিশ্রাম নিতে। বেশ কয়েকবার তাঁকে বসতে দেখেন কিন্তু আলাপ করা হয়ে ওঠেনি। পরে বিশ্ববিজয়ের পর স্বামীজীর ছবি কাগজে দেখে বুঝতে পারেন, কাকে তিনি বসে থাকতে দেখেছিলেন। তিনি যত্ন করে প্রস্তরখণ্ডটি তুলে নিজের বাড়ির মধ্যে রেখেছিলেন ও তাঁর বংশধরেরা কয়েকপুরুষ ধরে সেটিকে রক্ষা করছিলেন। বর্তমান প্রজন্ম সেটি কয়েকবছর আগে এই আশ্রমকে দান করেন। আশ্রম কর্তৃপক্ষ সেটি এক সুন্দর বৃত্তাকার আচ্ছাদনের নিচে রক্ষা করে তার ওপর স্বামীজীর পরিব্রাজক অবস্থার এক ব্রোঞ্জ নির্মিত উপবিষ্ট মূর্তি স্থাপনা করেছেন। চারিপাশ বাঁধানো এই বৃত্তাকার আচ্ছাদনের নিচে আর একটি লীলাধ্যানের সুন্দর জায়গা হয়েছে।

নির্দিষ্ট দিনে বাসস্টেশনের উদ্দেশে রওনা হলাম। এখানে দূরপাল্লার বাসের টিকিট থাকলে শহরের বাসে বাসস্টেশন যেতে ভাড়া লাগে না। বিশাল বাসস্টেশন, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, দোকান দিয়ে সাজানো, হকারের উৎপাত নেই। নির্দিষ্ট প্ল্যাটফর্মে বসলাম। যথাসময়ে বাস এসে লাগল। এই বাসসেবার নাম 'ঐরাবত'। সার্থকনামা, ধবধবে সাদা 'ভলভো' বাস। নির্দিষ্ট আসনে বসার পর একটি খবরের কাগজ ও এক বোতল জল দিয়ে গেল। বাতানুকূল, বিশাল কাচের জানালার পাশে আরামকেদারাতে অর্ধশায়িত হয়ে যাত্রা শুরু। শহর ছাড়িয়ে হাইওয়েতে পৌঁছে বাসটি দুরন্ত গতিবেগে ছুটে চলল নীলগিরির উদ্দেশে।

এ-পর্বতশ্রেণির নাম নীলগিরি কেন তা ঠিক জানা যায় না। দূর থেকে গগনস্পর্শী চূড়াগুলিতে আকাশের নীলিমার রং তো লাগেই। এছাড়াও একরকম লতানে গাছে কুরিঞ্জি বলে ঘন নীল ফুল হয় অজস্র। তার অদ্ভুত নীলরঙে ছেয়ে থাকা পাহাড়ের ঢালগুলো এই নামের অন্যতম দাবিদার হতে পারে।

জায়গাটি চিরকালই আদি জনগোষ্ঠীর এক্তিয়ারভুক্ত ছিল, একমাত্র টিপু সুলতান নির্মিত একটি গোপন ডেরা ছাড়া। ১৮১৯ সালে কোয়েম্বাটোরের কালেক্টর জন সুলিভান ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির পক্ষ থেকে এ-পর্বতশ্রেণি জরিপ করতে বেরোন। পাহাড়ের কোলে পৌঁছে ক্রমান্বয়ে ছদিন হেঁটে পৌঁছলেন এক উপত্যকায়। জায়গাটির সৌন্দর্য তাঁকে আকৃষ্ট করল খুব, ওড়ালেন ব্রিটিশ পতাকা। ব্রিটিশরাজ হোম ক্লাইমেট পেয়ে গড়ে তুললেন এক উপনগরী, যা পরবর্তী কালে মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির গ্রীষ্মকালীন রাজধানী হয়ে দাঁড়াল। সাড়ে সাত হাজার ফুট উঁচু, আশেপাশে প্রায় নয় হাজার ফুট পর্যন্ত উঁচু শৃঙ্গ এক হিমালয় ছাড়া সমতল ভারতে আর কোথাও নেই। স্থানীয় নাম উদগামণ্ডলম্, ব্রিটিশ উচ্চারণে দাঁড়াল উটকামণ্ড—তা থেকে সংক্ষেপে উটি।

ভাবনায় ছেদ পড়ল কন্ডাক্টরের ঘোষণায়, চমক ভেঙে দেখি বাস থেমেছে এক রেস্টুরেন্টের সামনে। আধঘণ্টা মধ্যাহ্নভোজনের বিরতি। ভোজনের পর আবার যাত্রা শুরু করে পৌঁছলাম পাহাড়ের কোলে। শুরু হল জঙ্গল—বান্দিপুর জাতীয় উদ্যান, জঙ্গলের মধ্য দিয়ে আঁকাবাঁকা পথ। হঠাৎ গাড়ির গতি ধীর, দেখি এক বিশাল হাতি প্রায় এক মণ ডালপালা শুঁড়ে নিয়ে রাস্তা পার হচ্ছে। উৎফুল্ল হয়ে দেখছি, হঠাৎ নজরে পড়ল গলায় ঘণ্টা বাঁধা। উৎফুল্লতা গেল কমে, এ নিছকই বনদফতরের পোষা হাতি। আরও বেশ কিছুক্ষণ চলার পর গাড়ির গতি শ্লথ হয়ে পড়ল, সামনের রাস্তায় সারবাঁধা গাড়ির ধীর গতিস্রোত। ব্যাপার কী দেখতে গিয়ে দেখি রাস্তা থেকে ত্রিশ-চল্লিশ ফুট দূরে এক বড় হাতির পাল ডালপাতা খেতে ব্যস্ত। এবারে কোনও ধোঁকা নয়। শ্রীরামকৃষ্ণের ভাষায় ধুলোকাদা মাখা হাতি। আমাদের দেখেই বাচ্চাগুলোকে মাঝখানে রেখে বড়গুলো আমাদের দিকে মুখ করে দাঁড়াল। গাড়ি থেকে সবাই ছবি তুলতে ব্যস্ত। আমাদের গাড়ির সার দেখে বোধহয় বিশ্বাস আর অবিশ্বাসের দোলায় তাদের শুঁড় আর কান ঘনঘন দুলতে লাগল। তাদের বিশেষ অপছন্দ হয়ে ওঠার আগেই আমরা আমাদের পুরনো গতিবেগে ফিরে গেলাম।

এদিকে আকাশের নীলমাখা নীলগিরির উত্তুঙ্গ পাহাড়শ্রেণি ক্রমশই পরের পর মাথা তুলতে লাগল। হিমালয়ের হিমবাহিত পর্বতচূড়ার বিশালত্বের গাম্ভীর্য এখানে নেই, কিন্তু শান্ত অদ্ভুত এক ধ্যানমগ্নতা আছে। যত এগোচ্ছি, ততই তা মনকে স্পর্শ করতে লাগল। সন্ধ্যাবেলায় পৌঁছলাম উটি বাসস্ট্যান্ড, সেখান থেকে অটো করে আশ্রম। বড় মহারাজ স্বামী সুখাত্মানন্দজী অপেক্ষা করে বসেছিলেন, আন্তরিক কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন, ‘‘এত দেরি হল যে?’’ বললাম, রাস্তাতে লেট করেছে বাস নানা কারণে।

ব্যাগ রেখে মন্দির। ঠাকুরের মর্মর মূর্তি। দুঃখিনী ব্রাহ্মণীর কোল আলো করে আসা ভূতলের অতুলমণি কোন অখ্যাত কামারপুকুর গ্রাম পেরিয়ে দক্ষিণভারতের এক পাহাড়চূড়ায় অনন্তপ্রসারী করুণাঘন দৃষ্টি মেলে বসে আছেন। কাছে গিয়ে নিবিষ্ট মনে দেখলে তাঁর গভীর অন্তর্মুখ দৃষ্টি বোঝা যায়, কিন্তু একটু দূর থেকে দেখলে আমাদের মতন সংসারতপ্ত মানুষের জন্য করুণাপূর্ণ চোখের আকুল আবাহন মনকে কেমন এক উদাস ভাবনায় ভরিয়ে দেয়। মনে হয় আমরা না এগোতেই তিনি কত শতসহস্র পা এগিয়ে বসে আছেন অথচ আমরা এক পাও এগোবার চেষ্টা করছি না।

মূর্তিটি দেখে মনে পড়ল রবীন্দ্রনাথের ‘মূল্যপ্রাপ্তি’ কবিতাটি, যাতে বুদ্ধদেবের অনিন্দ্যসুন্দর বর্ণনা আছে। হেমন্তের শিশিরাঘাতে সমস্ত পদ্মফুল মরে গেছে। সুহাস মালির ঘরে কীভাবে যেন একটি ফুল ফুটেছে। একজন পথিক অসময়ের পদ্মটি শ্রীবুদ্ধের চরণে দেবে বলে এক মাষা স্বর্ণমূল্যে কিনতে চাইল। এদিকে রাজা

প্রসেনজিৎ বুদ্ধ-সন্দর্শনে যাচ্ছেন। তিনি দশ মাষা স্বর্ণমূল্যে ওটি কিনতে চাইলেন।

''দোঁহে কহে 'দেহো দেহো', হার নাহি মানে কেহ—
মূল্য বেড়ে ওঠে ক্রমাগত।
মালী ভাবে যাঁর তরে এ দোঁহে বিবাদ করে
তাঁরে দিলে আরো পাব কত!''

তাই সে তাদের কাউকেই না দিয়ে নিজেই নিয়ে চলে শ্রীবুদ্ধদর্শনে। গিয়ে কী দেখল?

''বসেছেন পদ্মাসনে প্রসন্ন প্রশান্ত মনে,
নিরঞ্জন আনন্দমুরতি।
দৃষ্টি হতে শান্তি ঝরে, স্ফুরিছে অধর-'পরে
করুণার সুধাহাস্যজ্যোতি।''

মালি নির্বাক, পদ্মটি শ্রীচরণে দিয়ে ভূলুণ্ঠিত হল সে। স্বর্ণমূল্য প্রাপ্তির আশা কোথায় বিলীন। স্মিতহাস্যে বুদ্ধদেবের 'কী তব প্রার্থনা'র উত্তরে অস্ফুটে কোনওক্রমে বলল, ''চরণের ধূলি এক কণা।''

সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করে নজরুলের একটি গানের কলি মনে এল : ''ভিক্ষা চাহিলে মানুষ নাহি ফিরায়/ তোমার দুয়ারে হাত পাতিল যে/ ফিরাবে কি তুমি তায়?'' কিন্তু না, শ্রীরামকৃষ্ণ তো ফেরান না কাউকে, দেওয়ার জন্যই এত দূরে এসে বসে আছেন, কিন্তু নেওয়ার যোগ্যতা কই আমার! প্রার্থনা জানাই—তোমার কৃপালাভের যোগ্য করো ঠাকুর।

আশ্রমটি একটি পাহাড়ের ওপর থেকে নিচে রাস্তার ঢাল পর্যন্ত। ওপরে সমতল করে বাঁধানো বিশাল প্রাঙ্গণ, তার একদিকে মন্দির। দোচালা প্যাগোডা গড়নের নাটমন্দির, পাশে সাধুনিবাস, অফিস, অভ্যর্থনাগৃহ ও ঠাকুর-স্বামীজীর ভাবসাহিত্যের বিপণন কেন্দ্র। অপর দিকে পাহাড়ের সম্পূর্ণ ঢালটি আশ্রমের চা বাগান। এটি কোনও চা কোম্পানির সঙ্গে চুক্তি করা, যারা চা পাতা কেনে এ-বাগান থেকে। নিচে উপত্যকায় ও সামনের পাহাড়ের গায়ে সবজি খেত। গাজর হয় প্রচুর। তার সঙ্গে বিট, মুলো, আলু। হয়তো এই পাহাড়ি কাঁকর মেশা ঝুরঝুরে মাটিতে এগুলিই ফলে অজস্র। ওপর থেকে নিপুণ হাতে বোনা সারবদ্ধ সবজি গাছগুলি এক কারুকার্যময় সবুজ কার্পেট মনে হয়। দূরে পরের পর নীলাভ পাহাড়শ্রেণি আর এক বিশেষ ইউক্যালিপট্যাস গাছ, যার কালচে সবুজ পাতায় সাদা গুঁড়ো ছড়ানো—যা দেখে বরফ পড়েছে বলে মনে হয়। এ-দেশ বরফের নয় তবে এখানে জোলো ঠান্ডা আর হাওয়া যাতে হাত-পা কনকন করে।

এই ছবির মতন দৃশ্যাবলির মাঝখানে আশ্রমটির এক চমকপ্রদ ইতিহাস আছে। ১৯২৪ সালে মহাপুরুষ মহারাজ এলেন বায়ু পরিবর্তনে। মাদ্রাজে ম্যালেরিয়াতে আক্রান্ত হয়েছেন, জ্বর বিকেলের দিকে বাড়ে। ডাক্তারের পরামর্শে গরম দেশ মাদ্রাজ ছেড়ে এলেন নীলগিরিতে—উটি থেকে বারো মাইল দূরে কুন্নুর বলে এক জায়গাতে। উটিতে আগেই একটি রামকৃষ্ণ ভক্তসঙ্ঘ ছিল, তাদের ডাকে প্রায়ই আসতেন এখানে। সেই সময়েই তাঁর মনে এখানে একটি আশ্রম করার ইচ্ছা জাগে, যেখানে কাজকর্ম থেকে বিশ্রাম নিয়ে রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের সাধুরা মাঝে মাঝে জপধ্যানে দিন কাটাবেন। মহাপুরুষ মহারাজ ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন অতএব সাধু-ভক্তেরা উপযুক্ত জায়গার খোঁজ করতে লাগলেন। সেরকম জায়গা পাওয়া যাচ্ছে না, আর উৎকৃষ্ট জায়গা পছন্দমতো হলে সে-সম্পত্তির মূল্য দেওয়ার সামর্থ্যই বা কোথায়! এদিকে সে-যুগের তথাকথিত এক অস্পৃশ্য, পেশায় ধোপা, মা মারিয়াম্মার খুব ভক্ত—যে-দেবীকে আমাদের দেশে মা শীতলা বলে—তিনি উপর্যুপরি তিনরাত্রি স্বপ্নে দেখছেন যে মা শীতলা তাঁকে বলছেন—তোর তো অনেক জমি আছে, তোর কাছে সাধুভক্তেরা আসবে জমির খোঁজে; তাদের যা দরকার দিয়ে দিস। এদিকে ভক্তেরা নানা জায়গা খুঁজতে খুঁজতে তাঁর কাছে হাজির। মা শীতলার

ভক্তটি আনন্দে বিহ্বল। তিনি ছিলেন বত্রিশ একর জমির মালিক। বিশাল টাউন—যার নাম এখন রামকৃষ্ণপুরম—তার একটা পাহাড়ে দু একর জমি দান করে দিলেন। সেই অবিস্মরণীয় দাতার নাম তিরুভেঙ্কটম্ পিল্লে। জগন্নাথের রথ আপনি চলে, তার রশিতে যে হাত দেয় সেই ধন্য। শ্রীরামকৃষ্ণ কারও দ্বারা বাহিত হয়ে আসেন না, তিনি নিজেই আসেন, আমরা তাঁর পশ্চাদনুসরণ করি মাত্র। একথা বারবার প্রমাণিত হয়েছে।

মহাপুরুষ মহারাজ নতুন জমিতে ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করলেন, জোর কদমে কাজ চলল। দুবছর বাদে আবার এলেন, এবার উটিতেই, মঠপ্রাঙ্গণের কাছে এক বিশাল বাংলোতে তাঁর আবাস ঠিক করা হল। মহাপুরুষ মহারাজ দেহবোধরহিত, বিশাল জানালার ধারে আত্মমগ্ন বসে থাকেন। 'শিবানন্দ বাণী' গ্রন্থে পাই—একদিন মহারাজ প্রাতর্ভ্রমণের পর জানালার ধারে আরামকেদারায় বসে আছেন। সেবক হঠাৎ ঘরে ঢুকে দেখেন, মহারাজ স্থির, উদাসদৃষ্টিতে বসে। ভয় পেয়ে সেবক জিজ্ঞাসা করলেন, ''আপনার শরীর ভাল আছে তো, মহারাজ?'' তাঁর কানে কথাগুলি গেল বলে মনে হল না। তারপর আস্তে আস্তে ঠোঁট দুটি নড়ে উঠল। অস্ফুটকণ্ঠে বললেন, ''দেখ, এস্থানের আধ্যাত্মিক আবহাওয়া অতি চমৎকার। মন স্বতই অসীমের দিকে ছুটে যায়।... যত দিন যাচ্ছে, ততই সব আশ্চর্য আশ্চর্য ব্যাপার দেখে মুগ্ধ হয়ে যাচ্ছি।... বহু বৎসর পূর্বে হিমালয়ে... ঠিক এমনটি অনুভব হত।'' একটু থেমে আবার বললেন, ''সেদিন... দেখি যে, এ শরীর থেকে একজন বেরিয়ে এসে ক্রমে সমস্ত ভুবনে ব্যাপ্ত হয়ে গেল।'' তারপর একটু শ্বাস ফেলে বললেন, ''ঠাকুরই আমার অন্তরাত্মা, তিনিই এই বিরাট বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে ব্যাপ্ত হয়ে রয়েছেন।'' সেবক এ-অদ্ভুত আধ্যাত্মিক দর্শনের কথা শুনে অবাক হয়ে রইলেন। ১৯২৬-এর ২৪ সেপ্টেম্বর এক গাম্ভীর্যপূর্ণ আনন্দময় অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আশ্রমটি রামকৃষ্ণ অনুরাগীদের দায়িত্বে সমগ্র জনসমাজকে মহারাজ উৎসর্গ করে দিলেন।

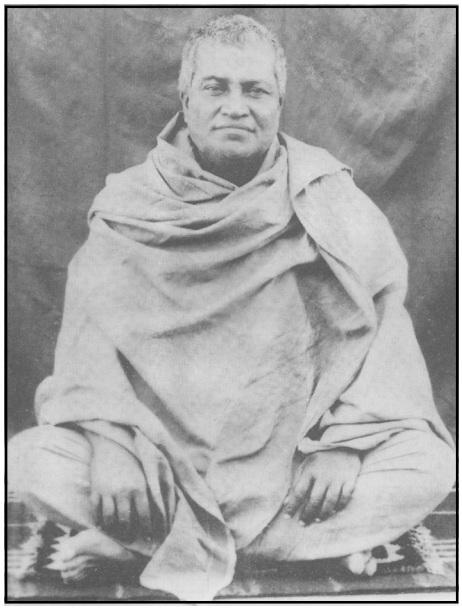

স্বামী শিবানন্দ

বাইরে কিছু কাজ করলেও, আশ্রমটি মূলত তপস্যার কেন্দ্র। বড় মহারাজ আর তাঁর দুজন সহকারী এই আশ্রমের আশ্রমিক। খাওয়াদাওয়া অত্যন্ত সরল, সাধাসিধে। দুপুরে ভাত ও সাম্বার, সঙ্গে কয়েক কুচি প্রসাদি ফল, রাতে রুটি আর ডাল, এক চামচ প্রসাদি সুজির পায়েস। প্রথম দিন মনে হল—এ কী, এ তো শুরু না হতেই শেষ! স্মরণে এল পূজ্যপাদ ভূতেশানন্দজীর উত্তরকাশীর তপস্যার কাহিনি। দুপুরে ভিক্ষা রুটি আর ডাল, ওই একবেলাই। সে-রুটি কুঠিয়াতে নিয়ে যাওয়া চলত না, ঠান্ডায় এত শক্ত হয়ে যেত। তৎক্ষণাৎ গঙ্গার ধারে বসে ভোজন আর রাতে হরিমটর। জিজ্ঞাসা করতাম, ''খিদে পেত না মহারাজ?'' বলতেন, ''অভ্যাস হয়ে গেছিল, তবে ঠান্ডায় কষ্ট হত।'' এখানে গরম খাওয়া টেবিলে বসে, ঠান্ডাও অসহ্য নয়, সুন্দর

মন্দির, কোথায় সদ্ব্যবহার করব তা নয়, এইসব চিন্তা। ধমক খেয়ে মন শান্ত হল।

প্রাঙ্গণটি নিত্য পরিষ্কার করেন একজন মহিলা, ছুটির দিনে কয়েকজন মিলে এই কাজটি করেন। জানলাম এঁরা সব স্থানীয় ভক্ত ও সম্পন্ন ঘরের বধূ। একদিন একজন আমার ধুতি-পরা মূর্তি দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, ''Are you from Bengal?'' বললাম, ''হ্যাঁ।'' তাতে তিনি বললেন, ''What a luck! You speak Thakur's language.'' কথাটা তীরের মতন এসে লাগল। ভাবলাম মনুষ্যজন্ম পেয়েছি। কোনও আদিম জনগোষ্ঠীতে না জন্মে সভ্যসমাজে জন্মেছি। ভোগবাদের প্রযুক্তির শীর্ষস্থানীয় দেশে না জন্মে, জন্মেছি আধ্যাত্মিক প্রযুক্তির শীর্ষদেশ ভারতে। তার ওপর অন্য কোনও প্রদেশে না জন্মে জন্মালাম ঠাকুরের দেশে তাঁর মুখের ভাষাকে মাতৃভাষা করে। তাঁর নিজের মুখের ভাষায় কথামৃত পড়বে বলে কত কষ্ট করে এরা বাংলা শেখে। আর এত সৌভাগ্যলাভ করেও আমার অবস্থা চৈতন্যদেবের আমাদের হয়ে আক্ষেপোক্তির মতন—''এতাদৃশী তব কৃপা ভগবন্ মমাপি দুর্দৈবমিদৃশমিহাজনি নানুরাগঃ'' (শিক্ষাষ্টকম্)। মনে মনে প্রণাম করলাম ভক্ত মহিলাটিকে।

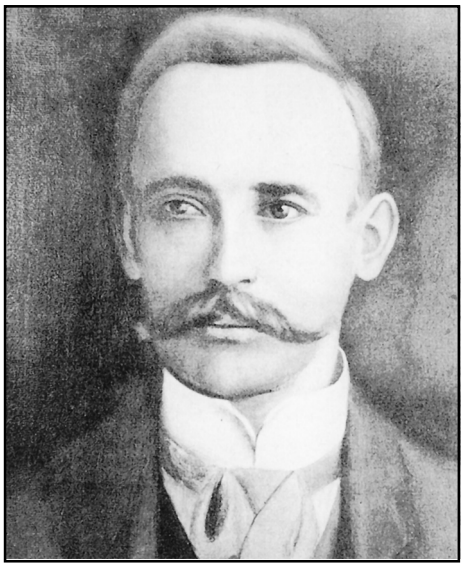

জে জে গুডউইন

আমেরিকা মহাদেশে ঝড় তুলে স্বামীজী ফিরেছেন ভারতে, সে-ঝড়ের অভিঘাত আছড়ে পড়েছে ভারতের মাটিতেও। সমগ্র ঝড়টির গতিপ্রকৃতি, আচারসর্বস্ব ধর্মের কুসংস্কারগুলি শুকনো পাতার মতন উড়ে যাওয়ার সমগ্র প্রক্রিয়াটিই নথিভুক্ত করেছেন এক তরুণ যুবক। জে জে গুডউইন তাঁর নাম। স্বামীজীর প্রেমের আকর্ষণে বাঁধা পড়েছেন, তাই স্বামীজীর ছায়াসঙ্গী হয়ে তাঁর ভারতে পদার্পণ। এখানেও কলম্বো থেকে আলমোড়া—বয়ে যাওয়া ঝড়ের প্রতিটি মুহূর্ত নথিভুক্ত করে তিনি ক্লান্ত। তাই কিছুদিন বিশ্রামের জন্য ঠান্ডা আবহাওয়ার শৈলাবাস উটিতে হাজির তিনি। দুর্ভাগ্য, এখানেই ধরল কালরোগে, কয়েকদিনের জ্বরে ১৮৯৮ সালে মাত্র আঠাশ বছর বয়সে দেহ ছেড়ে দিলেন তিনি। স্বামীজী মর্মাহত, Requiescat in Pace নামে এক অনবদ্য কবিতা লিখে পাঠালেন তাঁর মাকে আর বললেন, তাঁর বক্তব্যে যদি জগতের কোনও উপকার হয়ে থাকে তো তার প্রতিটি অক্ষরে গুডউইন বিরাজ করবে।

এখানে সেন্ট টমাস চার্চে অনেকের সমাধির মধ্যে অবিশিষ্ট হয়ে পড়েছিল তাঁর সমাধিফলক। স্বামী রঙ্গনাথানন্দজীর উদ্যোগে তাঁর গুণমুগ্ধ ভক্তেরা সেটিকে বিশিষ্টরূপ দান করেন। উটিতে এলে শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তদের অবশ্য কর্তব্য সেটি দর্শন করা, অতএব গেলাম দেখতে। বাসস্ট্যান্ডের কাছেই এক প্রাচীন গির্জা, সেখানে সমাধিক্ষেত্রে বেশ আয়াস করেই তাঁর সমাধি খুঁজে বার করতে হল। একটি সুউচ্চ ফলক—তার একপিঠে স্বামীজী লিখিত কবিতাটি ও এক পিঠে উদ্বোধক হিসাবে কলকাতা সহ সমস্ত প্রধান শহর ও পূর্ব ভারতের প্রধান বিশপ ড. ডি

মেলোর নাম ঘোষিত। সামনে জোসিয়া গুডউইনের জন্মমৃত্যু-সাল সহ একটি কৃপণ বাক্য : "He was Stenographer of Vivekananda"—ব্যস। সেখানে দাঁড়িয়ে মনে হল ঠাকুরের কী অদ্ভুত মহিমা! বলেছিলেন কেশবকে, এখানের ভাব যখন প্রচার হতে চাইবে তখন পাহাড় দিয়েও তাকে চাপা দেওয়া যাবে না। কোন সুদূর দেশ থেকে তাঁর গণেশকে জোগাড় করলেন তাঁর ব্যাসরূপী নরেন্দ্রনাথের শ্রুতিলেখক হিসাবে। আন্তরিক প্রণতি জানালাম সেই বিদেশি ত্যাগী পুরুষকে যিনি ঠাকুরের ভাবধারার জোয়ারের পথ তৈরি করতে প্রথম বলি তাঁর শ্রীচরণে।

আশ্রমের কাছেই সেই বাড়িটি যেটিতে মহাপুরুষ মহারাজ এসে উঠেছিলেন। নাম গোদাবরী হাউস। তিরুপতি মন্দিরের মূল পুরোহিতের গ্রীষ্মাবাস ছিল এটি। বেশ বড় জমির ওপর প্রাচীনকালের একতলা বাংলো আকৃতির বাড়ি। এর মালিকানা হাতবদল হয়ে এখন রিসর্টে পরিণত হতে যাচ্ছে। এ-বাড়িটিও ভক্তেরা দেখেন তবে কতদিন আর সে-সুযোগ থাকবে তা বলা যাচ্ছে না। এ-বাড়ির আরও বিশেষত্ব—স্বামী রঙ্গনাথানন্দজী (তখন শঙ্করন), মাইসোর আশ্রমে যোগদানের প্রাক্‌কালে স্বামী সিদ্ধেশ্বরানন্দজীর সঙ্গে এখানে এসেছিলেন মহাপুরুষ মহারাজকে দীক্ষার প্রার্থনা জানাতে। শিবানন্দজী চিনতে ভুল করেননি শঙ্করনকে। স্বামীজীর ভাবী অগ্রণী বার্তাবহকে দীক্ষা দিয়ে সঙ্ঘভুক্ত করে নিয়েছিলেন তিনি।

একদিন সকালে কয়েকজন ভক্ত এলেন, তার মধ্যে দুজন বিদেশিনী। নিখুঁত করে সাদা শাড়ি পরা। মন্দিরে বসে অনেকক্ষণ জপধ্যান করলেন। সামনের প্রাঙ্গণে আমাকে বেড়াতে দেখে আলাপ করলেন। কথার টানে মনে হল ইতালি বা ফ্রান্সের মানুষ, এখন ভারতবর্ষই ঘরবাড়ি। এখান থেকে কুড়ি কিলোমিটার দূরে একটি আশ্রমের কাছেই থাকেন। ঠাকুরের নামে মজে আছেন। এঁদের দেখে আনন্দ হল খুব। মনে পড়ে গেল একজন ভক্ত পূজ্যপাদ স্বামী ভূতেশানন্দজীকে বিদেশ ঘুরে আসার পর জিজ্ঞাসা করলেন, ''মহারাজ, সে-দেশ কেমন দেখলেন?'' মহারাজ বললেন, ''আমি দেশ দেখতে তো যাই না, আমি দেখি কত দেশে কত বিভিন্ন ভাষার আর রুচির মানুষ ঠাকুরের নাম নিচ্ছে, তাদের দেখে তাদের নিয়ে আনন্দ করি।''

এই সূচপতনের নৈঃশব্দ্যে ঘেরা আশ্রমে নয়দিন কেটে গেল দেখতে দেখতে। রাতের বাস ভোরে পৌঁছয় ব্যাঙ্গালোর। মন্দির বন্ধ হওয়ার আগে ঠাকুরকে প্রণাম করে বিদায় জানাব, মনে পড়ল সেই ঘটনাটি। স্বামী চেতনানন্দজী ফিরে যাচ্ছেন আমেরিকা, বিদায় নিতে গেছেন প্রেসিডেন্ট মহারাজ ভূতেশানন্দজীর কাছে। প্রণাম করে বলছেন, ''এটি বিদায়ী প্রণাম মহারাজ, আজকে ফিরছি সেই দেশে, কোনও বিদায়বাণী দেবেন কি?'' শুনে মহারাজ বললেন, ''আমার কোনও বিদায়বাণী নেই, আমার কাছে চিরমিলন। আমার কাছে আসন আছে যাওন নেই। তুমি দূরে যাচ্ছ বলে আমাদের দূরে করে দিও না, আমরা বিচ্ছিন্ন থাকতে পারি না।'' প্রণামশেষে প্রার্থনা জানালাম : ''ঠাকুর, তুমিই তো মহারাজের হৃদয়ে থেকে তাঁর মুখ দিয়ে তোমার কথাই বলেছ। আমার হৃদয় তোমার বাসস্থানের যোগ্য করে তুলতে পারিনি, এখন 'নিজ গুণে যদি রাখ কমলাকান্তেরে দেখ' এইটুকুই বলতে পারি।''

বড় মহারাজকে প্রণাম করে, আবার সুযোগ পেলে আসার আগাম অনুমতি সংগ্রহ করে সকল আশ্রমিকদের কাছে বিদায় চাইলাম। তাঁদেরই খবর দেওয়া অটোরিকসা এল নিতে, বোঝা তুলে যাত্রা শুরু। নামলাম রাস্তায়। এবারে শুধুই নেমে চলা বাসস্ট্যান্ডের উদ্দেশে, বিশ্বসংসারের দিকে।